

এই সময়ের রবীন্দ্রনাথ : ব্রাত্যজনের তত্ত্বচিন্তা বিনায়ক সেন

বাউল সম্প্রদায়ের একজন লোককে একবার রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘তোমরা সকলের ঘরে খাও না?’ সে উত্তর দিয়েছিল, ‘না’। কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে বলেছিল, ‘যারা আমাদের স্বীকার করে না আমরা তাদের ঘরে খাই না।’ রবীন্দ্রনাথ তখন বললেন, ‘তারা স্বীকার না করে নাই করল, তোমরা স্বীকার করবে না কেন?’ সে লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সরলভাবে বলল, ‘তা বটে। ওই জায়গাটাতে আমাদের একটু প্যাঁচ আছে’। রবীন্দ্রনাথকে ‘এই সময়ের’ জন্য আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যেও যেন ‘একটু প্যাঁচ’ আছে। এখনও আমরা ঠিক সংস্কারমুক্তভাবে রবীন্দ্রনাথকে বিচার করতে পারি না। কখনও আমরা তাঁকে ঋষির আসনে বসিয়ে সব তর্কের উর্ধ্বে রাখি, আবার কখনও ‘মহৎ কবি’ ভেবে বা তাঁর গানের মধ্যে মন্ত্রমুগ্ধ থেকে সমাজ-অর্থনীতি-রাষ্ট্র আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁকে অপাংক্তেয় করে রাখি। এটা একটু বিস্ময়কর। বিপুলায়তন রবীন্দ্র-রচনাবলির দুই-তৃতীয়াংশের বেশি হচ্ছে গদ্য-রচনা এবং গদ্য-রচনার মধ্যে প্রবন্ধ আলোচনা-চিঠিপত্র সংখ্যাধিক্যে। এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের সবচেয়ে বড় অংশই আবার সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম-অর্থনীতি-রাজনীতি নিয়ে। এই অংশটির প্রতি আমরা খুব বেশি মনোযোগ দেইনি। সুবিচার করেছি তার চেয়েও কম। অথচ রবীন্দ্রনাথ শুধু তাঁর কালের বড় তত্ত্ব-চিন্তক ছিলেন তা-ই নয়, এই সময়ের জন্যও তিনি অগ্রণী এক তত্ত্ববিদ। ‘তাত্ত্বিক’ অভিধা তাঁরই প্রাপ্য। কিন্তু কোন অর্থে?

মতাদর্শগত আলোচনার প্রচলিত বাম-ডান-মধ্যপন্থার ধারায় রবীন্দ্রনাথকে ঠিক আবদ্ধ করা চলে না। তিনি বাঁধা গণ্ডির বাইরে নিজের চিন্তাকে প্রসারিত করে আমাদের অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দেন প্রায়ই। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে প্রথাগত মতের (সামাজিক বা তাত্ত্বিক) সমর্থন মিলছে কি-না সেটি তাঁকে প্রভাবিত করে না। তিনি রাশিয়ায় গিয়ে প্রশংসার পাশাপাশি তিরস্কার করতে ভোলেন না, আবার আমেরিকায় গিয়ে প্রত্যাশার স্বীকৃতি জানিয়েও হতাশাকে স্পষ্ট করায় পিছুপা হন না। তাঁর মন সর্বত্রগামী না হলেও বহু বিচিত্র বিষয়ের অনুগামী—তাঁর সমসাময়িকেরা এই বিচিত্রবিধ অনুসরণের ‘গ্রামার’ বুঝতে অপারগ। তিনি ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় উপনিষদের পাশাপাশি বাউল মতকে গুরুত্বের সঙ্গে স্থান দেন। আবার সনাতনপন্থীদের ধারণা ভেঙে বেঙ্গল স্কুল অব আর্টের পুরোধা অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালকে জার্মান এক্সপ্রেসনিজমের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি সন্ত কবীরের গানের নিবিষ্ট অনুবাদ করেন ইংরেজিতে, আবার ইংরেজিতে লেখেন *ন্যাশনালিজম* বক্তৃতামালা, যার বাংলা তর্জমা করতে কুণ্ঠাবোধ করেন জাতীয়তাবাদীরা। নেশনের ব্যভিচার তাঁর রাজনৈতিক রুচির বিরুদ্ধে—তাই তিনি অন্য কোনো প্রত্যয় না পেয়ে ‘নেশন’ ও ‘নো-নেশন’-এর তুলনা টানেন। বঙ্কিমের ‘বন্দে মাতরম’-এর সুরারোপ করেন তিনি, আবার এ গানে মুসলমানদের মনোকষ্ট হওয়ার যথেষ্ট পরিমাণে কারণ রয়েছে সঙ্গতভাবেই এ কথা গান্ধীকে স্মরণ করিয়ে দেন। তাঁর রচিত গান গেয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন অবিভক্ত ভারতে ও পরবর্তী সময় বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদের বা উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। আবার ভারতের (এবং বাংলাদেশের) জন্য *ন্যাশনালিজম*ের পথ সঠিক পথ নয় বলে আমাদের ভদ্র সম্প্রদায়কে বিচলিত করে তোলেন।

কখনও তিনি আধুনিকের আধুনিক, সর্বাধুনিক চলতি হাওয়ারপন্থী, কখনও তিনি প্রাগ-আধুনিক, *সামাজিক প্রবন্ধের* ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতোই ভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রনৈতিক ঐতিহ্যের (নিও-ট্রাডিশনালিজম) সমর্থক। গান্ধীকে ‘মহাত্মা’ আখ্যা তাঁরই দেওয়া, আবার ধর্মাশ্রিত রূপকের ভিত্তিতে গান্ধীর গড়ে তোলা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা তাঁর থেকেই সবচেয়ে জোরালোভাবে আসে। ‘মেশিন’ (যন্ত্র-সভ্যতা) ও ‘অর্গানাইজেশন’ (দমনমূলক রাষ্ট্র) নির্ভর ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে

বাংলায় ও ইংরেজিতে অজস্র বার তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু গান্ধীর চরকা এবং গ্রামজীবনকে মহিমাম্বিত করতে চাননি এক মুহূর্তের জন্য। তিনি জমিদারি চালিয়েছেন, রায়তের কথা ভেবেছেন, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পথ খুঁজেছেন, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁর দাদাঠাকুর দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন ১৮৩০-৪০ দশকের সর্বাগ্রগণ্য বাঙালি বুর্জোয়া, তাঁকে মনে রেখে একটি লাইন কবিতাও লেখেননি তিনি। বরং বেস্থাম-মিলের বুর্জোয়া মন্ত্রের বিরুদ্ধে ‘অন্যের ধনে লোভ করো না’ বলে বারবার মুনাফাকেন্দ্রিক অর্থব্যবস্থা ও ব্যক্তি-স্বার্থপরতার সমাজের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তাই বলে তাঁকে ঘোর সমাজতন্ত্রী বলারও জো নেই। রাশিয়ায় গিয়ে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ‘মানব-প্রকৃতি’-এর কথা।

বলশেভিক অর্থনীতি স্থালিনের হাতে পড়ে যে অবস্থায় পৌঁছেছিল তা শেষ পর্যন্ত ‘মানব-প্রকৃতি’-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ধারায় বিকশিত হতে পারবে কি-না এ নিয়ে তাঁর দুর্ভাবনা ছিল। পরবর্তী সময় আমরা দেখেছি মানব-প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ভাষা বিনিময়ের স্বাভাবিক মাধ্যমের মতো পণ্য-বিনিময়ের স্বাভাবিক বাজার-ব্যবস্থা ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে এসে রাষ্ট্রনির্ভর সমাজতন্ত্র কীভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপরও রাশিয়ার যে দিকটি তাঁর ভালো লেগেছিল—সবার কাছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতিকে পৌঁছে দেওয়ার ‘সাধনা’—সেটি বলতে দ্বিধা করেননি আমৃত্যু। ‘রাশিয়ার চিঠি’-এর ইংরেজি অনুবাদ *মডার্ন রিভিউ*-এ প্রকাশের পরপরই বেআইনি ও বাজেয়াপ্ত হয়ে গিয়েছিল; তাঁর জীবদ্দশায় সেই অনুবাদ আর প্রকাশ পায়নি। তারপরও ত্রিশের দশকের রাশিয়ায় পরমতসহিষ্ণুতার অভাব ও গণতান্ত্রিক মত প্রকাশের ওপর স্থালিনীয় রাষ্ট্রের অত্যাচার-নির্যাতন ইত্যাদি বামাচারের পক্ষে কখনও সাফাই গাইতে তাঁকে শোনা যায়নি। তার মানে এই নয় যে, জীবনে তিনি ভুল করেননি। অনেকবারই করেছেন। ভুল হয়েছিল মারাত্মক (যেমন: মুসোলিনির স্বরূপ বোঝার ক্ষেত্রে প্রথম দিকে), বিচ্যুতিও ঘটেছিল; বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে শরিক হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা এখানে বিস্মৃত হওয়ার নয়। বেশিরভাগ ভুলগুলো যথাসম্ভব শুধরে নিয়েছেন—পরবর্তী সময় মুসোলিনির ও অন্যবিধ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এবং ‘স্বদেশী সমাজ’ আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বহুত্বসব থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে (যে কথা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন)। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির তত্ত্বগত মূল বিষয়ে তার মানস-কম্পাস ভুল করেনি।

রাষ্ট্রের শাসন প্রণালির বিপরীতে পুরসমাজের প্রতি পক্ষপাতিত্বে, পুরসমাজের অনুশাসনের বিপরীতে লোকসাধারণের সপক্ষে, লোক সাধারণের সংস্কারাচ্ছন্ন লোকাচারের বিরুদ্ধে সহিষ্ণু লোকধর্মের অস্বেষায় তিনি অটল ছিলেন। ‘মহাজাতি’ গঠনে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ইতিহাসের স্বীকৃতি ও এ দুইয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ‘সমকক্ষতা’ আনার জন্য আজকের যুগের ভাষায় ‘এফারমেটিভ অ্যাকশন’-এর প্রয়োজনীয়তাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজে প্রথাগত হিন্দু সমাজের কেউ ছিলেন না, ব্রাহ্মসমাজেও তাঁর স্থান হয়নি। এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেছেন কাদম্বিনী দেবীকে ১৯১০ সালেই: ‘নানা কারণে ব্রাহ্মসমাজ আমাকে ঠিক ব্রাহ্ম বলে গ্রহণ করেননি এবং আমাকে তাঁরা বিশেষ অনুকূল দৃষ্টিতে কোনোদিন দেখেননি। এই ভূমিকাটুকু আবশ্যিক। ...যখন আমরা সত্যই ঈশ্বরকে চাই তখন আমরা নিজের বা অন্যের সঙ্গে লেশমাত্র চালাকি করতে পারিনে। এই রকম অবস্থায় আমি আমাদের দেশপ্রচলিত দেবপূজার প্রণালীকে কেন যে সমস্ত মন থেকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছি, তা নিশ্চয়ই আমার সমস্ত শান্তিনিকেতনের লেখাগুলোর ভেতরে কতকটা প্রচ্ছন্ন ও কতকটা প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত হয়েছে।’ ‘প্রাচ্য’ বলতে তিনি কেবল ভারতবর্ষের পুরাকালের অতীতকে বোঝাননি, যেমন ‘পাশ্চাত্য’ বলতে শুধু বোঝাননি বিজ্ঞানভিত্তিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে। প্রাচ্য তাঁর কাছে প্রকাশিত হয়েছিল নানারূপে—পারস্য থেকে দূরপ্রাচ্য অবধি, আবার তার সংজ্ঞায়নও ঘটেছিল ভূগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। যেমন, তিনি ‘ভারত’কে ভেবেছিলেন ভৌগোলিকভাবে নির্দিষ্ট কোনো সমাজ হিসেবে নয়, বরং নৈতিক ‘আইডিয়া’ হিসেবে—যা

পাশ্চাত্যের ছকের অন্ধ অনুকরণের বদলে আমাদের হয়তো বিকল্প-আধুনিকতার সন্ধান দিতে পারে। আধুনিকতার ওপর পাশ্চাত্যেরই কেবল একচেটিয়া অধিকার নেই—এ কথা রবীন্দ্রনাথই প্রথম বলেছিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতবর্ষ বা মধ্যযুগের মুসলমান সভ্যতা বা সুপ্রাচীন চীন আধুনিক পাশ্চাত্যের চেয়ে পিছিয়ে ছিল না। আবার পাশ্চাত্যকে বাদ দিয়েও উত্তর-ঔপনিবেশিক মনের মুক্তি নেই। ভারতের ইতিহাস কেবল হিন্দুর ইতিহাস নয়, মুসলমানেরও ইতিহাস, তেমনি আবার ইংরেজেরও ইতিহাস। যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি সেই ‘ছোট ইংরেজদের’ শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ‘বড় ইংরেজদের’ নিয়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক মনকে পুনর্নির্মাণ করার প্রস্তাব ছিল তাঁর। এই সত্যনিষ্ঠা যেমন সহজ ছিল না তাঁর স্বদেশীয় জাতীয়তাবাদের পক্ষে গ্রহণ করা, তেমনি এই সত্যনিষ্ঠাই তাঁকে চালিত করেছিল প্রতিবাদের প্রকাশ হিসেবে ইংরেজদের দেওয়া নাইটহুড বর্জনের ক্ষেত্রে। দুটিই চলেছে পাশাপাশি। তাঁর প্রাচ্য তাঁর স্ব-উদ্ভাবিত প্রাচ্য যেমন, তাঁর পাশ্চাত্যও তেমনি তাঁর স্ব-নির্মিত।

এই যে বিভিন্ন ধারার ও ধারণার পাশাপাশি অবস্থান একে বুঝতে গিয়ে স্ববিরোধিতা, দ্বৈরথ, দ্বন্দ্ব—এসব প্রথাগত শব্দবন্ধ আমরা এখানে ভাবতে পারি হয়তো, কিন্তু তা হবে ভুল ভাব। এসব শব্দ-তকমা রবীন্দ্রনাথের একান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা নিজস্ব তত্ত্বীয় ভুবনকে ছুঁতে পারে না। যে বিচিত্রবিধ উৎস থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যুক্তি-তর্ক-গল্প আহরণ করেছেন তার পরিধি বিশাল। তাঁর স্বকালের স্বদেশীয়রা সহজে তা অনুধাবন কতে পারেননি, যেমন অনেক সময়ই এখনও রবীন্দ্রনাথের গদ্যের সামনে দাঁড়িয়ে বিচলিত বোধ করি আমরা। যেন ইউক্লেডীয় জ্যামিতির চর্চায় হঠাৎই আমরা মুখোমুখি হয়ে পড়েছি নন-ইউক্লেডীয় জ্যামিতির। যেমনটা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন আইনস্টাইনকে—কোয়ান্টাম বিশৃঙ্খলা যেমন সত্য, তেমনি সত্য মহাজাগতিক শৃঙ্খলা। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর তত্ত্বচিন্তা—তাঁর ভাষা ধার করেই বলি—‘সহজ নয় সে গান’।

২.

তাহলে ‘তাত্ত্বিক’ ছিলেন তিনি কোন অর্থে? গোড়ার এই প্রশ্নে আবারও ফিরে আসি। তত্ত্ব-নির্মাণে তিনি যে প্রথাগত ধারায় চলছেন না, বরং তিনি প্রথা-বিরোধিতার মধ্য দিয়ে নিজস্ব একটি বক্তব্য ক্রমেই নির্মাণ করছেন এই সচেতনতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আগাগোড়াই ছিল। জীবনের উপাস্তে (১৯৩৬ সালে) এসে ‘পত্রপুট’-এর পনেরোতম কবিতায় তিনি নির্দিষ্ট করে বললেন, ‘আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন’। একবার নয় কিছুক্ষণ পরপর বিরতি দিয়ে পরপর পাঁচবার নিজেকে বললেন ‘আমি ব্রাত্য’—আমি তোমাদের দলের/শ্রেণীর কেউ নই, ‘আমি পংক্তি হারা’, শুধু অপাংক্তেয় নয়, জাতিচ্যুতও—‘আমি জাতিহারা’। হেগেলের ফেনোমেনলজিতে লেনিন তাঁর ফিলোসফিক্যাল নোটবুকসে যেমন পেয়েছিলেন বস্তুবাদের সবচেয়ে বড় খনি, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় তেমনি পাওয়া যাবে তাঁর মন্ত্রহীনতার সবচেয়ে বড় নির্দেশিকা।

মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত বাংলা একাডেমীর *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* ‘ব্রাত্য’ শব্দের অর্থ দিয়েছে এভাবে: পতিত, সংস্কারহীন, ব্রত ভ্রষ্ট, আচার ভ্রষ্ট। এখানে আরও যোগ হতে পারত আর দুটি অর্থ: অন্ত্যজ, মন্ত্রবর্জিত—যেমনটা আমরা পাই পত্রপুটের কবিতাটির শিরোনামায়। তত্ত্বের ভুবনে তিনি এসেছেন ভিন্ন চেতনার বাহক হয়ে, বয়ে নিয়ে এসেছেন ভিন্ন এক বাণী। সেটা বঙ্কিমের ‘বাহুবল’ নয়, সে তত্ত্বের সম্ভাব্য পরিণতি তিনি ‘স্বদেশী সমাজ’ আন্দোলনের কালেই প্রত্যক্ষ করেছেন। বাহুবল নয়—পরস্পরের প্রতি সহর্মিতা; এক্ষেত্রে তাঁর নিকটতমজন রামমোহন রায়। তিনি নিজেকে ব্রাত্য ভাবছেন সেটা এ কারণে নয় যে তাঁর জন্ম হয়েছিল ‘পিরালী ব্রাহ্মণ’ বংশে, সেটা এ কারণেও নয় যে কবিতাটি নিম্নবর্ণের ‘মনের মানুষ’ খুঁজে ফেরা বাউলপথের স্বীকৃতি কেবল। সমাজতাত্ত্বিক নিম্নবর্ণীয়তা থেকে উদার মনের চর্চা উঠে এসেছে—বুর্জোয়া উদারনৈতিকতা থেকে নয়—এটিও তাঁর প্রধান আলোচ্য নয়। তাঁর দৃষ্টি নিবন্ধ প্রথাগত তত্ত্বের বাইরে যে তত্ত্ব সেদিক পানে।

‘যে দেখা বানিয়ে-দেখা বাঁধা ছাঁচে’ তার বাইরে যে তত্ত্ব, যে অনুশীলন, তার প্রতি তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। কেননা ‘নানা শাস্ত্রের যে দেবতা’ তার প্রমাণ মেলেনি তাঁর জীবনে, ‘রীতিবন্ধনের’ বাইরে এসে তবেই তাঁর মনন পূর্ণতা পেয়েছে। এই খোঁজা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ভেদ অতিক্রম করে যায় ‘দেশ-বিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে’। এর জন্য তাঁকে অপমানিত হতে হয়েছে, পতিত হতে হয়েছে, সংস্কারকে পরিত্যাগ করতে হয়েছে, আচার ভ্রষ্ট হতে হয়েছে—এ কথা কতবার তিনি হেমন্তবালা দেবীকে পত্রালাপে জানিয়েছেন নানাভাবে। চিরাচরিত সংজ্ঞার জাতি নয়, স্বজাতি নয়, স্বদেশও নয়, বরং চিরকালের যে মানুষ, যা দেশ কাল ইতিহাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে জেগে উঠেছে, সেই ‘সকল মানুষের মানুষ’ তাঁর তত্ত্ব-নির্মিত আদর্শ সমাজের নাগরিক। সেখানে ‘ভেদচিহ্নের তিলক পরা সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য’ নেই, জাতীয়তাবাদের নামে ‘ভৌগোলিক অপদেবতার’ উপাসনা নেই, সে জন্যই তিনি বলছেন, পথে পথে ঘুরে বেড়ানো সন্ত বাউলের মতো তিনিও ‘দলের উপেক্ষিত’, তিনিও ‘জাতিহারা’। নিম্নবর্ণের ইতিহাস পরবর্তী সময় যারা নির্মাণ করেছিলেন, তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, গ্রামসির মতো তিনিও প্রথাগত ইতিহাস চর্চার বাইরে অন্য একটি জ্ঞানকাণ্ডের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন—যার উদ্বোধন হচ্ছে অন্ত্যজ বলয় থেকে, ‘সকল মন্দিরের বাইরে।’

এখানে কারও কারও মনে একটি আপত্তি জাগতে বাধ্য। পত্রপুটের কথিত কবিতাটি নিছকই কবিতা, উৎকৃষ্ট কবিতা ঠিকই কিন্তু কবিতাই কেবল। হয়তো ‘এবার ফিরাও মোরে’ ধারার—যেখানে ছিল মাটি ও মানুষ, কৃষকের-শ্রমিকের কথা। পার্থক্য এই যে, পত্রপুটে এসে পাচ্ছি ‘মনের মানুষের’ সুফি-সন্ত-বাউল অন্ত্যজ শাস্ত্রবিবর্জিত নিম্নবর্ণের উপাসকদের কথা হয়তো—এর বেশি কিছু নয়। এখানে তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মিলছে কোথায়? এ আপত্তির উত্তরে আমাদের ফিরে যেতে হবে রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনায় আবার—উদাহরণত ১৯২৬ সালে ‘ভারতীয় দার্শনিক সংঘের সভাপতির’ অভিভাষণে। সেখানে একই বক্তব্য আরও তীব্র ও আরও জোরালো ভাষায় বলা হচ্ছে—প্রান্তজনের কবি হিসেবে নয়, মনস্ক গদ্যের দার্শনিক হিসেবে।

পদ্য বনাম গদ্যের লড়াইয়ে সেখানে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তার আগে প্রথমেই ঠুকেছেন গ্লেটোকে : ‘দার্শনিক **প্রবল** গ্লেটো তাঁহার আদর্শ গণরাষ্ট্র হইতে কবিদের নির্বাসিত করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দর্শন চিরদিন কাব্যকে মিত্রপক্ষীয় বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছেন। কারণ এখানে দর্শনের চরম লক্ষণ সাধারণের জীবনকে অধিকার করা—বিদগ্ধমণ্ডলীর রুদ্ধদ্বার খাসকামরা আশ্রয় করা নহে। এই জন্যই বোধহয় শঙ্করাচার্যের মতো দার্শনিকের প্রতিও অনেক কবিতার আরোপ করিতে আমাদের জনশ্রুতি কিছুমাত্র দ্বিধা করে নাই। অথচ এই শঙ্করাচার্যকে কোনো আতিথ্যদেষ্টী “ইমিগ্রেশন” আইনের সাহায্যেই গ্লেটো তাঁহার আদর্শরাষ্ট্র হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। ...আমাদের জনসাধারণ সহজেই তত্ত্বদর্শীকে কবিত্বের অধিকার দিয়া থাকে যখন তাঁহার ধীশক্তি প্রজ্ঞার আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে।’ এ কথা তত্ত্বজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের জন্যও বলা যেত।

পাশ্চাত্যের তত্ত্ব চর্চার মতো প্রাচ্যের তত্ত্ব চর্চার মধ্যে ‘পদ্য-গদ্য বিরোধ নেই’ এই ইঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথ যে পার্থক্য রচনা করলেন তা প্রণিধানযোগ্য। বস্তুত এনলাইটেনমেন্টের পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকরা কবিতাকে কিছুটা পরিহার করেই এসেছেন গদ্যের আঙ্গিকে তত্ত্ব রচনার শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিয়ে। কান্ট, হেগেল কেউই কবিতা লেখেনি, যেমন লেখেননি বেঙ্কাম-মিল। পিতা জেমস্ মিল তো পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিলকে কবিতা পাঠ থেকে আশৈশব বিরত রেখেছিলেন পাছে তাঁর তত্ত্বানুসন্ধানী পুত্র বিপথগামী হয়! অথচ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা এসেছিল শেলীর কলম থেকেই এবং ভ্রমণ-পিপাসু (যাযাবর মনের) রোমান্টিকরা পুঁজিবাদের ভেতর কাঠামোর অসুন্দর পরিত্যাগ করে নতুন ইউটোপিয়া রচনায় বৃত্ত ছিলেন (ওরিয়েন্টালিজমের দোষ সত্ত্বেও এটা বলা যায়)। শেক্সপীয়ার এবং গ্যোটে উভয়েই ছিলেন স্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক। হাইনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল উন্মেষ-যুগের সমাজতন্ত্র—সে কথা মার্কস স্বীকার

করেছেন। আর বোদলেয়ারের চেয়ে ১৮৪৮ সালের পরাজয়ের পর পুঁজিবাদের সমালোচনা কাব্যলোকে আর কেউ উনিশ শতকে লিখে রেখে যাননি। লাতিন আমেরিকায় বিশ শতকে কবিতা ও নতুন সমাজ দর্শন এবং রাজনৈতিক আন্দোলন হাত ধরাধরি করে চলেছে পেশোয়া, ভায়োহো, নেরুদা ও কার্দেনালের লেখায়।

রবীন্দ্রনাথ পদ্যে এক রকম, গদ্যে আরেক রকম—পদ্যে তিনি জাতীয়তাবাদের পক্ষে। গদ্যে তিনি জাতীয়তাবাদবিরোধী। পদ্যে তিনি মিথ-আশ্রিত প্রাচ্যপন্থী আর গদ্যে তিনি বিজ্ঞান-আশ্রিত পাশ্চাত্যপন্থী এ রকম মত সম্প্রতি কেউ কেউ রেখেছেন। এই মতের সপক্ষে কোনো প্রামাণ্যতা নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তত্ত্ব-নির্মাণের ক্ষেত্রে পদ্যে ও গদ্যে উভয় উৎসারণেই একই ভাবগত ঐক্যের মধ্যে কাজ করেছেন। তাঁর *নৈবেদ্য*, তাঁর *গীতাঞ্জলি*, তাঁর *ঘরে-বাইরে*, তাঁর *ন্যাশনালিজম*, তাঁর *চিত্রাঙ্গদা*, তাঁর *রক্তকরবী*, তাঁর *রাজা*, তাঁর *রাশিয়ার চিঠি*—তত্ত্ব-নির্মাণের নানা পর্যায়কে তুলে ধরেছে। গদ্যে-পদ্যে তিনি জাতীয়তাবাদের বিভীষিকা তুলে ধরেছেন, যেমন গদ্যে-পদ্যে তুলে ধরেছেন যন্ত্র-সভ্যতা ও বিচ্ছিন্নতার পরিণাম। তাঁর বিরচিত ইউটোপিয়ায় যে মহামানবের কথা উচ্চারিত তার অভিন্ন প্রকাশ দেখি পদ্যে ও গদ্যে—‘ঐ মহামানব আসে’ থেকে শুরু করে জীবন-সায়াহের ‘সভ্যতার সংকটের’। দার্শনিক সংঘের সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ কাদের বলছেন ‘তত্ত্বদর্শী’? প্রথমেই তিনি স্মরণ করলেন *মহাভারতের* কথা। এখানে তিনি খুঁজে পেলেন মতের বিভিন্নতার প্রতি ঔদার্য: ‘কত নীতি, রাষ্ট্রীয় ও অধ্যাত্ম তত্ত্বের কত বিচার-বিন্যাস এই মহাভারতের উদার আয়তনে কেমন সহজে আশ্রয় পাইয়াছে।’ এটা বলার গূঢ় কারণ হচ্ছে, এক-নেশন তত্ত্বের বাইরে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন বহু বিচিত্র মতের সহাবস্থানে গড়ে ওঠা ‘প্লুরালিস্ট’ সমাজ-ব্যবস্থা। প্রাচীন মহাভারতের উদাহরণ টেনে নতুন (উত্তর-ঔপনিবেশিক) সমাজ ও রাষ্ট্র নির্মাণের তাগিদ থেকেই হয়তো এটা লিখে থাকবেন। নইলে বলতেন না, এখানে (প্রাচীন ভারতবর্ষে) ‘সাহিত্যের বিভিন্ন গোষ্ঠী এক বিরাট সাধারণতন্ত্রে (‘স্পিরিট অব কমিউনিজম’) বিধৃত। আমাদের এই জাতিটি বিচিত্র তর্কবিতর্ক জটিল পন্থা আশ্রয় করিয়া সেই ভাবলোকে ভ্রমণ করিতে ক্লান্তি বোধ করে না যাহা অসংখ্য উপাখ্যানের উপগ্রহ পরিবেষ্টিত একটি মহাআখ্যায়িকার সৌরমণ্ডল বলিলেই হয়।’ এখানে বলা দরকার যে, এই ভাষণের বাংলা ও ইংরেজি রূপান্তরের মধ্যে কিছু কিছু শব্দের ব্যবহারে পার্থক্য রয়ে গেছে। ইংরেজি পাঠে ‘জাতি’ শব্দটি নেই, রয়েছে জনগণ (‘পিপল’); তর্ক-বিতর্ক জটিল পন্থার পরিবর্তে পাই ‘মেনি ব্রাঞ্চড পাথ্ অব আ হোল ওয়ার্ল্ড অব থটস্, হেল্ড টুগেদার ইন আ গাইগানটিক অবর্ব অব ন্যারেটিভ’। যা হোক শুধু মহাভারতেই রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক উদাহরণ সীমিত নয়। বিচিত্র পন্থার সমাবেশ ঘটেছে আমাদের সমাজে, তার প্রমাণস্বরূপ তিনি এরপর দৃষ্টি দিলেন মধ্যযুগের সুফি-সন্তদের প্রতি: ‘মুসলমান যুগে এই ভারতে যেসব সাধুসন্ত আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই গীতরসিক। তাঁহাদের গান ভাবের আগুনে দীপ্তিমান। তাঁহাদের ধর্মবোধ তত্ত্বজ্ঞানের মর্মস্থল হইতে উৎসারিত। মানবের চিরন্তন প্রশ্নগুলি ও জীবনের চরম সার্থকতা লইয়া তাঁহাদের কারবার। হয়তো ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কথা নাই। কিন্তু যখন দেখি যে তাঁহাদের সেই সমস্ত বাণী, সমস্ত সঙ্গীত কেবলমাত্র শিক্ষিত পণ্ডিতমণ্ডলীর জন্য নহে, তাহা গ্রামে গ্রামে নিরক্ষর নর-নারীর আদরের ধন, তখন বুঝতে পারি দর্শন বস্তুটি কী গভীরভাবে আমাদের সাধারণের মগ্ন চৈতন্যলোকে প্রবেশ করিয়াছে এবং সমস্ত জীবনকে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।’

কাদের উদাহরণ টানা হলো এই সূত্রে? প্রথমেই এলেন সন্ত কবীর, যিনি লিখেছিলেন এটা যদি সত্য হয় যে, নির্গুণ ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজমান, তাহলে তীর্থস্থান হিসেবে মথুরা বা কাশীর তাৎপর্য থাকে কী? এই সেই সন্ত কবীর যিনি লিখেছিলেন ‘মন্দিরেও নেই, কাবাতেও নেই’—ঈশ্বর সর্বসাধারণে। রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদের সূত্রেই সন্ত কবীরের রচনার সঙ্গে পাশ্চাত্যের পরিচয় ঘটে। অন্যত্র (যেমন ক্ষিতিমোহন সেনের সন্ত দাদুর ভূমিকায়) তিনি স্মরণ করেছেন মধ্যযুগের অন্য সন্তদের, যারা হিন্দু-মসুলমানের যুক্ত সাধনায়

অংশ নিয়েছিলেন। তবে দর্শন কংগ্রেসের অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন ছিল গ্রামবাংলার বাউল কবিদের রচনার বিনম্র উল্লেখ। পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য কবিদের মধ্যে তিনি খুঁজে পাচ্ছেন দর্শনের বড় একটি তত্ত্ব—সেটি হচ্ছে ‘ব্যক্তিস্বরূপের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রেই বিশ্ব সত্য’ হয়ে ওঠে এই উপলব্ধি। একটি লাগসই উদ্ধৃতিও দিলেন: ‘মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন/শরীরে করিল পয়দা শক্ত আর নরম/আর পয়দা করিয়াছে ঠাণ্ডা আর গরম/নাকে পয়দা করিয়াছে খুষবয় বদবয়’। এ রকম আরও কিছু উদ্ধৃতির পর তাঁর বলার কথা হলো, ‘বাউল সম্প্রদায় আমাদের বাঙলার সেই শ্রেণী হইতে আসিয়াছে যাহারা প্রচলিত অর্থে শিক্ষিত নয়।’ এঁরা তত্ত্ব-চর্চা করলেও ‘তত্ত্ববিদ্যার কোনো ধার ধারেন না, সেটা বেশ একটু জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন’। এই সাব-অলটার্ন বাউল-তাত্ত্বিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আবার খুঁজে পেলেন উপনিষদের দর্শন। এভাবেই তাঁর তত্ত্ব-চিন্তা ক্রমাগত মিলিয়ে যাচ্ছে অপ্রত্যাশিত ও প্রত্যাশিত উপাদানকে—দর্শনের সঙ্গে লোকজীবন, সুফি ভাবনার সঙ্গে সর্ব সম্প্রদায়ের যুক্তসাধনা, উপনিষদের সঙ্গে বাউল মন, সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে লোকসাহিত্য। একই সূত্রে বাঁধা পড়েছেন প্রাচীন ঋষি, মধ্যযুগীয় সুফি ও একালের গ্রাম্য কবি। বস্তুত এই প্রবন্ধেই তিনি লালনের ‘খাঁচার ভিতর অচিন পাখি’র লাইন দুটি উদ্ধৃত করে তুলনীয় প্রসঙ্গ টানলেন (আবারও অপ্রত্যাশিতভাবে) ইংরেজ কবি শেলীর। পত্রপুটের পূর্বে উদ্ধৃত কবিতাটির শেষ চরণের মতো এই প্রবন্ধেও ‘মনের মানুষ’ বারবার ফিরে এলো। প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার বাইরে লালনের মতো রবীন্দ্রনাথেরও ‘মনের মানুষ’ খুঁজে ফেরা। তত্ত্ব-চিন্তায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের উৎসে ফিরে যাওয়া, প্রাচ্যের মধ্যে আবার নানা প্রাচ্যে ফিরে যাওয়া—রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনায় এ রকম বারবারই ঘটেছে, আমরা তাতে স্বস্তি পাই বা না পাই, তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না এমনই মৌলিকভাবে তিনি বহুত্ববাদী। পরবর্তীকালের জন রাউলসের মতোই তিনি বিশ্বাস করতেন ‘যুক্তিসঙ্গত বহুত্ববাদ’-এর (রিজনিবল প্লুরালিজম) চর্চায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে তাঁর আদর্শস্থানীয় ‘বিচিত্র তর্ক-বিতর্ক জটিল’ সমাজ। হয়তো অমর্ত্য সেনের ‘তর্কপ্রিয় ভারতীয়’ তত্ত্বের আদি প্রেরণা ছিল রবীন্দ্রিক এই আদর্শ সমাজের ধারণা।

৩.

তবে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—নিজস্ব তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি বিস্তার করতে গিয়ে প্রাচীন (কখনও কখনও মধ্যযুগীয়) ভারতবর্ষ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সময় সময় যেসব উদাহরণ টেনে আনেন তা কি ইতিহাস-আশ্রিত নাকি তাঁর কল্পলোকের সৃষ্টি কেবল? আধুনিক যুক্তির সপক্ষে প্রয়োজনে অনৈতিহাসিক প্রাচীন দৃষ্টান্ত টানা এই ইম্পট্রমেন্টাল রিজনিং কতটা গ্রহণযোগ্য?

এ ক্ষেত্রে প্রথমেই যেটা বলা দরকার, উনিশ শতকীয় রেনেসাঁর প্রধান পুরুষদের একটি কুললক্ষণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সেটি হলো—তর্কপ্রিয়তা, স্থায়িতত্ত্ব/বক্তব্য প্রমাণে জোরালো পলেমিক্‌সের আশ্রয় নেওয়া, এককথায় সমাজ সংস্কার জাতীয় বিষয়ে বাকবিতণ্ডা ও প্রয়োজনে তত্ত্বগত কাজিয়ায় নেমে পড়া খুব বেশি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না করেই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বঙ্কিম, ভূদেব—সবার জন্য এটা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ যেহেতু দীর্ঘজীবনের অধিকারী ছিলেন তাঁর গদ্য রচনা দেখলে মনে হবে তাঁর মতো তর্কিক তাঁর কালে খুব কমই ছিলেন। বলতে গেলে, স্বভাবজ বিতর্কবাদী ছিলেন তিনি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রসঙ্গে, এমনকি অপ্রতিরোধ্যভাবে নিরীহ নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েও। প্রথম যুগের রবীন্দ্রনাথকে মনে হবে এ ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণধী তর্কিক বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী। যে কারণে বঙ্কিমের পর *বঙ্গদর্শনের* সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তায় রবীন্দ্রনাথের ওপরই। তবে বঙ্কিম সময় সময় সমালোচনার ক্ষেত্রে যতটা রুঢ় (বা নির্দয়) ছিলেন পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে তা অনেকটাই কমে আসে। এক পর্যায়ে তিনি কোনোভাবে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে পড়লেও তা থেকে নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করেই রাখতে চাইতেন। তারপরও এখানে যেটা প্রাসঙ্গিক, তর্কে প্রবৃত্ত হয়ে

তাৎক্ষণিকভাবে যুক্তি উদ্ভাবন করা বা কোনো সুহৃদ বা নিকট অতীতের বাস্তব বা কল্পিত উদাহরণ টেনে আনা রবীন্দ্রনাথের জন্য স্বভাব-বিরুদ্ধ কিছু ছিল না।

ন্যাশনালিজম বক্তৃতামালায় বহুল আলোচিত তাঁর ‘নেশন’ বনাম ‘নো-নেশন’ তুলনা/প্রতি তুলনা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। পাশ্চাত্যের ইতিহাস রাষ্ট্রকেন্দ্রিক এবং সে জন্য সেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ‘নেশন’-এর রাজনৈতিক নাগরিকবোধের সমসত্ত্বতা ও ঐক্যের ওপর গড়ে উঠেছে প্রাচ্যের (ভারতের) ইতিহাস সমাজকেন্দ্রিক। সেখানে রাজশক্তির বিপর্যয়ে সমাজ বিপর্যস্ত হয় না; রাজা আসে-যায় তাতে পাখিদের কি এসে যায় একথা রবীন্দ্রনাথও বলতে পারতেন। ১৯০২ সালে ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধে তাঁর মূল কথাই এ-ই: ‘ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটি দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে-ছেলেয় ভাইয়ে ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল, এক দল যদিবা যায়, কোথা হইতে আর-এক দল উঠিয়া পড়ে—পাঠান-মোগল পর্তুগিজ-ফরাসী-ইংরাজ সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্ন দৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবাসী কোথায়, এ-সকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।’ এরপর তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বলতে পারতেন, ‘আইস, এক্ষণে আমরা সকলে মিলিয়া ইতিহাস লিখি!’ তা না করে তিনি যেটা চাইলেন সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিকের সুখ-দুঃখ, তার জীবনচর্চা, তার দর্শন, তার অন্তরাত্মার ধারা বিবরণী লিখতে। সে জন্যই লিখছেন: ‘ঝড়ের দিনে যে ঝড়ই সর্বপ্রধান ঘটনা, তাহা তাহার গর্জন সত্ত্বেও স্বীকার করা যায় না; সেদিনও সেই ধূলি সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যুর সুখ-দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। কিন্তু বিদেশী পণ্ডিতের কাছে এই ঝড়টাই প্রধান। এই ধূলিজালই তাহার চক্ষু আর-সমস্তই গ্রাস করে, কারণ সে ঘরের ভিতরে নাই। সে ঘরের বাহিরে। সেই জন্য বিদেশীর ইতিহাসে এই ধূলির কথা, ঝড়ের কথাই পাই; ঘরের কথা কিছুমাত্র পাই না’।

‘ঘরের ইতিহাস’ লিখতে গিয়ে তিনিও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো কোনো ‘স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস’ লিখতে চেয়েছেন বলে মনে করলে ভুল হবে। হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের ‘ন্যারেটিভে’ কল্পিত ইতিহাসের কিছু উপাদান রয়েছে, কিন্তু তারচেয়ে বেশি আছে প্রথাগত ইতিহাস বিদ্যার সমালোচনা। রণজিৎ গুহ ইতিপূর্বে এ দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আরও বলছেন, ‘ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। ...ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাস্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন, যেখানে পলিটিক্স নাই সেখানে আবার হিস্ত্রি কিসের, তাহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্যের মধ্যেই গণ্য করেন না।’ ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ প্রবন্ধে বিকল্প ধারার সে মৌলিক থিসিস রবীন্দ্রনাথ উত্থাপন করলেন তার যৌক্তিক পরিণতি—পরবর্তীকালের স্বদেশী সমাজ (১৯০৪), ও ন্যাশনালিজম (১৯১৭) প্রবন্ধগুচ্ছ এবং ঘরে বাইরে (১৯১৬) উপন্যাস। এসব লেখায় ইতিহাস বিদ্যার রাজনীতিনির্ভর আখ্যায়িকার সমালোচনার মূলে রয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভিন্ন ধরনের সমাজ প্রণালি ও ভিন্ন ধারার আধুনিকতা খোঁজা। এটা খুঁজতে গিয়ে সময় সময় তাঁকে ‘কল্পিত সমাজ’-এর দ্বারস্থ হতে হয়েছে, যার সত্যতা বা অসত্যতা ইতিহাস-উপাদানের আর্কিওলজির ওপর দাঁড়িয়ে নিরূপণ করা দুরূহ। যেমন—‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে তিনি যুক্তি দিচ্ছেন, ‘বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে—ভারতবর্ষ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল’। সত্যই কি তাই করেছিল? একথা প্রথাগত

ইতিহাসবিদ্যার নিরিখে নির্ণয় করার উপায় এখনও সীমিত। এর কারণ প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ সম্পর্কে যা পাওয়া যায় প্রথাগত ইতিহাসের কল্যাণে, তা খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন উপাদানই কেবল—তাতে করে সেকালের পুরো সমাজ চিত্রটা আমাদের চোখের সামনে আজও পূর্ণভাবে দেখতে পাই না। কোশাম্বী থেকে রোমিলা থাপার, হাসান দানী থেকে ইরফান হাবিব ঘাঁটলেও এ সমস্যার সমাধান হয় না। ভাষা-বিজ্ঞানের মাধ্যমে নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস রচনাতেও এর সমাধান মেলে না, সে চেষ্টা ইতিপূর্বেই বন্ধিমে আমরা দেখেছি। ফলে প্রাচ্যের ‘কল্লিত সমাজ’ জানতে গিয়ে বারবার ফিরে যেতে হয় ধর্মগ্রন্থে, পুরাণে, মহাকাব্যে, প্রবচনে, লোকগাথায়। রবীন্দ্রনাথ এ কাজটিই করেছেন তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে উদাহরণ টানার ক্ষেত্রে। ওয়েল্ডি ডনিজের-এর বিশালকায় *হিন্দুইজম* গ্রন্থটি প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ইতিহাস রচনায় পুরাণভিত্তিক পর্যালোচনার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ।

মোদাকথা, রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চিন্তা ও স্বদেশ চিন্তা ভিন্ন এক ইতিহাস এবং ভিন্ন এক স্বদেশ-কল্পনাকে সামনে তুলে ধরে। একে আমরা জ্ঞানচর্চায় ‘পজিটিভিজম’-এর সমালোচনা হিসেবে দেখলে বাড়াবাড়ি করা হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি লেখায় ‘স্বদেশ কী’ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ‘আমাদের জন্মভূমি তিনটি, তিনটিই একত্র জড়িত। প্রথম পৃথিবী। মানুষের বাসস্থান পৃথিবীর সর্বত্র। ...মানুষের বস্তুত বাসস্থান এক। ভিন্ন ভিন্ন জাতির নয়, সমগ্র মানবজাতির। মানুষের কাছে পৃথিবীর কোনো অংশ দুর্গম নয়। পৃথিবী তার কাছে হৃদয় অব্যাহত করে দিয়েছে। ...মানুষের দ্বিতীয় বাসস্থান স্মৃতিলোক। ...মানুষ জন্মগ্রহণ করে সমস্ত পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে। ...তার তৃতীয় বাসস্থান আত্মিকলোক। সেটাকে বলা যেতে পারে সর্বমানবচিন্তার মহাদেশ। অন্তরে অন্তরে সকল মানুষের যোগের ক্ষেত্র এই চিন্তলোক’। গানেও একথা বলেছেন, ‘বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো’ সেখানেই দেখা হবে।

‘জন্মভূমি’র এ সংজ্ঞাকে আমরা কী বলব? গোলকায়নের পরিস্থিতিতে নতুন সংজ্ঞা বললে বড় বেশি কেজো শোনাবে। যদি বলি, এর থেকেই ‘ন্যাশনাল’ ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ যেন হাবেরমাসের মতো কোনো ‘পোস্ট ন্যাশনাল’ পৃথিবীর কথা ভাবছেন, সেটা হবে খণ্ডিত-পাঠ। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বজ্ঞান মন থেকে যে জন্মভূমির পাঠ তাঁর গদ্যে, পদ্যে বা গানে বেরিয়ে এসেছে, তাঁর ব্রাত্য কমরেড সে যুগের (এবং এ যুগের) বাউল সম্প্রদায়ের কবি-দার্শনিকরা তাতে পুরোপুরি সায দিতেন। কেননা তাঁরাও সারা জীবন মনের মানুষকেই খুঁজে ছিলেন জাতি-সত্তা, নেশন-স্টেট ও নির্দিষ্ট ভূগোল ইতিহাসের গণ্ডির বাইরে। তবে উচ্চবর্গীয় সমাজের কানে রবীন্দ্রনাথের এই গান ‘অন্য ভুবনের’ বলেই ঠেকবে।